Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

কোরিয়া সংকট

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে কোরিয়া হল পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। কোরিয়ার উত্তর সীমান্তে মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণে পূর্ব চীনসাগর, পূর্বদিকে জাপান এবং পশ্চিম দিকে পীত সাগর। কোরিয়া এবং জাপানের মধ্যে বিভাজন রেখা হল সিমনোসেকি প্রণালী বা কোরিয়া প্রণালী। কোরিয়ার উপর দীর্ঘদিন চীনের প্রভুত্ব ছিল। ১৮৯৪ – ৯৫ সালে চীন –জাপান যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করলে কোরিয়ার উপর জাপানের আধিপত্য কায়েম হয়। জাপান শক্তিশালী হয়ে সাম্রাজ্যবাদ নীতি গ্রহণ করলে সে কোরিয়াকে নিজের নিয়ন্ত্রনে আনার সর্ববিধ চেষ্টা করেছিল। ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান জয় লাভ করে কোরিয়াকে তার নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। ১৯১০ সালে সুযোগ পাওয়া মাত্র জাপান কোরিয়াকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কোরিয়া ছিল জাপানের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৪৩ সালে কায়রো সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও চীন স্থির করে যে কোরিয়াকে জাপানের প্রভাবমুক্ত করে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হবে। ১৯৪৫ সালের পটসডাম সম্মেলনেও ঐ একই সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। সোভিয়েত সরকার যখন ১৯৪৫ সালে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন কায়রো সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সোভিয়েত সরকার মনে নিয়েছিল। রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার সময় ঠিক হয়ে যে কোরিয়ার ৩৮° সমান্তরাল রেখার উত্তরে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাধান্য ও দক্ষিণে মার্কিনীদের প্রাধান্য থাকবে। কারন জাপানকে যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করানোর জন্য মার্কিন বাহিনী কোরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে কোরিয়া জাপানের হাত থেকে হয়তো মুক্ত পায় এটা ঠিক কিন্তু কোরিয়া দুই মহাশক্তির অর্থাৎ সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বীতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কোরিয়া কে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা লড়াই এশিয়াতে চলে আসে।

কোরিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই মহাশক্তির মধ্যে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেয় যে কোরিয়াতে অস্থায়ী ভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠন করা হবে। কিন্তু

কোরিয়া সমস্যার সমাধান হয়নি বরং এই সমস্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোরিয়াকে নিয়ে কোন সমাধানসূত্র না বের হওয়ার ফলে কোরিয়া সমস্যাকে আমেরিকা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পেশ করেছিল। আমেরিকার উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৪ই নভেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারন সভা কোরিয়া সম্পর্কে ৯ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি অস্থায়ী কমিশন গঠন করেছিল। এই কমিশনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কোরিয়াতে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে এবং কোরিয়া থেকে বিদেশী সেনা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতের কূটনীতিবিদ কে. পি. এস. মেনন এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাব কে অগ্রাহ্য করেছিল এবং রাষ্ট্রসংঘ নিযুক্ত কোনো কমিশন উত্তর কোরিয়াতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল।

১৯৪৮ সালের ১০ই মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়াতে নির্বাচন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানায় যে, উত্তর কোরিয়াতে জাতিপুঞ্জের নিযুক্ত কমিশন প্রবেশ করতে না পারার জন্য বাধ্য হয়ে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিযোগ ছিল দক্ষিণ কোরিয়াতে যে নির্বাচন হয়েছিল তা আসলে লোক দেখানো। আসলে দক্ষিণ কোরিয়াতে তাদের তাঁবেদার সরকার গঠনই হল মার্কিনীদের উদ্দেশ্য। ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট সিংম্যান রির নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়াতে সরকার গঠিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়াকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ দেওয়া হয়। দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন ঘাঁটিতে পরিণত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী হয় সিওল।

অন্যদিকে, সোভিয়েত সরকার উত্তর কোরিয়াতে রাষ্ট্রসংঘের নিযুক্ত কমিশনের সভ্যদের প্রবেশের অনুমতি না দিলেও ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর কোরিয়াতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিল। এখানে মস্কোর প্রভাবাধীনে জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সরকারের প্রধান ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা কিম উল- সুণ্ড। উত্তর কোরিয়ার রাজধানী হয় পান-মুন-জঙ্গ। উত্তর কোরিয়ার নাম হয় জনগণতান্ত্রিক কোরিয়া বা .....। এইভাবে দুই বৃহৎ শক্তির প্রভাবে কোরিয়া ঠাণ্ডা লড়াই এর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরিণতিতে কোরিয়ার ঐক্য ধুলিস্যাৎ হয় এবং কোরিয়া দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারন সভা সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারই হল কোরীয় জনগণের বৈধ সরকার। সাধারন সভা কোরিয়া থেকে বিদেশী সেনা প্রত্যাহারের দাবী জানায়। সাধারন সভা ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেছিল। এই কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য কোরিয়ার ঐক্যকে নিয়ে আসা। কিন্তু এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার ঐক্য চায়নি। দক্ষিণ কোরিয়াতে মার্কিনীরা নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে চেয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়া ছিল কৃষি প্রধান দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে দক্ষিণ

কোরিয়ার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিন অনুগত সিংম্যান রির সরকার মার্কিন অর্থের সাহায্যে উন্নতি ঘটাতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ২৪শে আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৭৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছিল। ১৯৫৭ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১০ মিলিয়ন ডলার। দক্ষিণ কোরিয়াকে সামরিক দিক দিয়েও শক্তিশালী করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দিয়েছিল। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য সংখ্যা ১,০০,০০০-র উপরে ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে পরিকল্পিত ভাবে সাহায্য ও মদত দিয়ে কোরিয়া উপদ্বীপে এক উত্তেজনাকার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫০ সালে সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কেনেথ রয়াল ও প্রতিরক্ষা সচিব জনসন পর্যায়ক্রমে দক্ষিণ কোরিয়া সফর করে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের পরামর্শদাতা জন ফস্টার ডালেস দক্ষিণ কোরিয়ার আইনসভার ভাষণে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ মার্কিন সাহায্য-পুষ্ট দক্ষিণ কোরিয়া সংকটে মার্কিনীদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায়না।

১৯৫০ সালের ২৫শে জুন উত্তর কোরিয়া ৩৮° রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়াতে সৈন্য প্রেরন করলে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোরিয়া যুদ্ধের সূচনা হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার বক্তব্য ছিল এই যুদ্ধের পিছনে তাদের কোন ভূমিকা নেই । কিন্তু সমস্ত বিষয়কে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সোভিয়েত সমর্থন ছাড়া উত্তর কোরিয়া কখনই যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে সাহস করতো না। দক্ষিণ কোরিয়াকে উত্তর কোরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে সোভিয়েত রাশিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দর ও উপকুলভাগ কে বানিজ্যের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তাই বলা যায়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেমন কোরিয়া যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিল তেমনি সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকাও যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সংগ্রাম শুরু হলে আমেরিকার দাবীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক বসেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বয়কট করেছিল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে আমেরিকার প্রভাবে নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব নেয় উত্তর কোরিয়া আক্রমনকারী। নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়াকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। নয়টি সদস্য রাষ্ট্র এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। যুগোশ্লাভিয়া ভোট দানে বিরত ছিল। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান দক্ষিণ কোরিয়াকে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। মার্কিন নৌবহর ও বিমান বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়।

১৯৫০ সালের ২৭শে জুন নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে সিংম্যান রির সরকারকে সকল ধরনের সাহায্য দেওয়া হবে। যুগোশ্লাভিয়া এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল। মিশর ও ভারত ভোটদানে বিরত থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী

চীন ও উত্তর কোরিয়া এই প্রস্তাবকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিল। ৭ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদের আর একটি প্রস্তাবে কোরিয়াতে জাতিপুঞ্জের বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাত ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থারকে জাতিপুঞ্জের বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভারত, মিশর ও যুগোশ্লাভিয়া ভোটদানে বিরত থাকে। ডেনমার্ক, ভারত, ইতালি, নরওয়ে, সুইডেন মেডিক্যাল ইউনিট প্রেরন করেছিল। দক্ষিণ কোরিয়াও তার সেনাবাহিনীকে জাতিপুঞ্জের হাতে তুলে দিয়েছিল।

ফলস্বরূপ ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে নিরাপত্তা পরিষদের বাহিনী কোরিয়া যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কোরিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র সংঘ বাহিনীর সৈন্যদের শতকরা ৫০ ভাগ ছিল মার্কিন সেনা, ৪০ ভাগ দক্ষিণ কোরিয়ার এবং বাকি ১০ ভাগ অন্যান্য দেশের। বিমান বাহিনী সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছিল। এই বাহিনী উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদের ৩৮° রেখার উত্তরে বিতাড়িত করেছিল এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে উত্তর কোরিয়া পদানত হয়। চীন সীমান্ত সংলগ্ন ইয়ালু নদীর তীর পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনি অগ্রসর হয় এবং ঐ এলাকায় বোমারু বাহিনী বোমা বর্ষণ করেছিল। এই সুযোগে সাম্যবাদী চীন কে আক্রমণ করা ছিল মার্কিনীদের আসল উদ্দেশ্য। মার্কিন বাহিনী চীনের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছিল। স্বাভাবিক অর্থে চীনের পক্ষে এই যুদ্ধে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিল না।

নিরাপত্তা পরিষদে ১৯৫০ সালের ৬ই নভেম্বর চীনকে আক্রমণ ও কোরিয়ায় হস্তক্ষেপের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করে ও মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। ৯ – ১ ভোটে এই প্রস্তাব খারিজ হয়। ভারত ভোটদানে বিরত ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনা বাহিনী উত্তর কোরিয়া কে সমর্থনের জন্য এগিয়ে এসেছিল। কোরিয়া যুদ্ধের প্রকৃতি এরপর পাল্টে যায়। চীনের যোগদানের ফলে কোরিয়া যুদ্ধ আন্তর্জাতিক চরিত্র লাভ করেছিল। এই যুদ্ধ হয়ে পড়ে চীন – মার্কিন যুদ্ধ। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান কোরিয়ার উপর অ্যাটম বোম ব্যবহারের ভয় দেখান। ম্যাক আর্থারটন চীন ও উত্তর কোরিয়ার উপর ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটি অ্যাটম বোম নিক্ষেপের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু চীনের সঙ্গে স্থায়ী যুদ্ধ করা ঠিক হবে না বলে সাধারন মার্কিনীদের ধারনা হয়। এশিয়াতে দ্বিতীয়বার আণবিক বোমা ফেলার ব্যাপারে এটলি ওয়াশিংটনে গিয়ে তার উদ্বেগের কথা জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও অন্যান্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ৩৮° রেখা অতিক্রম না করার জন্য উভয় পক্ষকে আবেদন জানান। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য ম্যাক আর্থার কে পদচ্যুত করেন। এসবের পরিণতিতে যুদ্ধের গতি মন্থর হয়।

সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধ বিরতির জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। ১৯৫০ সালের জুন মাসে জাতিপুঞ্জে সোভিয়েত প্রতিনিধি যুদ্ধ বিরতি ও অস্ত্র সংবরণের জন্য ৩৮° রেখা থেকে উভয় পক্ষের বাহিনী সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে আলাপ আলোচনা চলেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে এবং কমিউনিস্ট আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে দক্ষিণ কোরিয়া যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হয়। উত্তর কোরিয়া, চীন ও জাতিপুঞ্জের মধ্যে ৫৭৫ টি বৈঠকের পর এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিল এবং পান মুন জঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩৮° রেখা ধরে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিভাজন বজায় থাকে। উভয় পক্ষ যুদ্ধ-বন্দীদের ফিরিয়ে দিতে রাজী হয় এবং তা ৬০ দিনের মধ্যে কার্যকর হবে বলে স্থির হয়। ভারতের সভাপতিত্বে একটি কমিশনের মাধ্যমে বন্দী বিনিময় হবে বলে স্থির হয়। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পারস্পারিক বিবাদের জন্য এই কমিশনের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সহ অন্যান্য সভ্যদের ধৈর্য ও উদারতার ফলে শেষ পর্যন্ত বন্দী বিনিময়ের মতো কঠিন কাজ সমাধান হয়েছিল।

কোরিয়া যুদ্ধ ঠাণ্ডা লড়াইকে এশিয়ার ভূখণ্ডে সম্প্রসারিত করেছিল। এতদিন পর্যন্ত ঠাণ্ডা লড়াই ইউরোপের ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল। বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থের তাগিদে এশিয়াতে এই যুদ্ধকে টেনে এনেছিল। কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিনীদের যোগদানের কারন ছিল বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোরিয়াকে সংযুক্ত করে সেখানে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে কায়েম করা। কোরিয়াকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধের ফলাফল মার্কিনীদের সেই আশাকে পূরণ করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৮° রেখার বিভাজন মানতে বাধ্য হয়। মার্কিনীদের হস্তক্ষেপ চীনকে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধ্য করে। মূলত কোরিয়া যুদ্ধের সূত্র ধরে আমেরিকা সাম্যবাদী চীনকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই প্রত্যাশাও পূরণ হয়নি।

অবশ্য কোরিয়ার যুদ্ধ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক শিক্ষাই নিয়েছিল। চীন – সোভিয়েত মৈত্রী যে মার্কিন স্বার্থের প্রতিবন্ধক এটা বুঝতে তাদের অসুবিধা হয়নি। কোরিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জোটের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল। ১৯৫১ সালে জাপানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, আস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ANZUS চুক্তি, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে CENTO জোট, সিয়াটো জোট ইত্যাদি আমেরিকা সম্পাদন করেছিল। তাই বলা যায় যে কোরিয়া যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ বিরোধী রণকৌশল গ্রহণে বাধ্য করেছিল।